কমিউনিটি ক্লিনিকঃবন্ধু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়

সেলিনা আক্তার

গণমুখী স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে আস্থার ঠিকানা হিসেবে কাজ করছে কমিউনিটি ক্লিনিক। দেশ স্বাধীনের পর সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে প্রথম কমিউনিটি স্বাস্থ্যসেবার ধারণা নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি বলেছিলেন, কমিউনিটি স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে যাবে। তার যুগোপযোগী ধারণা বাস্তবায়িত হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে। ২০০০ সালের ২৬ এপ্রিল গোপালগঞ্জ জেলার পাটগাতী ইউনিয়নে গিমাডাঙ্গা কমিউনিটি ক্লিনিকের উদ্বোধনের মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নের যাত্রা শুরু করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সে যাত্রা কমিউনিটি স্বাস্থ্যসেবায় বিপ্লব ঘটিয়েছে। যার স্বীকৃতিও এসেছে দেশ-বিদেশ থেকে।

Community অর্থ নিদিষ্ট এলাকার জনগণ,আর Clinic অর্থ স্বাস্থ্যসেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ নিদিষ্ট এলাকার জনগণের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার নাম কমিউনিটি ক্লিনিক। (Community Clinic). বিশ্বের অনেক দেশ প্রান্তিক পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে আমাদের কমিউনিটি ক্লিনিক মডেল নিয়ে কাজ করছে। আমাদের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্যখাতে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। ২০৩০ সালের মধ্যে সব বয়সের সব মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসেবা ও কল্যাণ নিশ্চিত করা কমিউনিটি ক্লিনিকের মূল্য উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৮(১) তে বলা আছে, জনগণের পুষ্টি স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলে গণ্য করবেন। এতে স্পষ্ট যে, সমগ্র বাংলাদেশের, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের মানুষের চিকিৎসা, পুষ্টি স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। আর রাষ্ট্রের সেই কর্তব্য পালনের অগ্রাধিকারমূলক পদক্ষেপ হচ্ছে কমিউনিটি ক্লিনিক (সিসি) – Community Clinic (CC) ।

কমিউনিটি ক্লিনিক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দশটি বিশেষ উদ্যোগের একটি।কমিউনিটি ক্লিনিকের সাফল্যগাথা নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি পুস্তিকার নাম কমিউনিটি ক্লিনিক: হেলথ রেভল্যুশন ইন বাংলাদেশ।কমিউনিটি ক্লিনিকের অগ্রযাত্রায় ‘শেখ হাসিনার অবদান, কমিউনিটি ক্লিনিক বাঁচায় প্রাণ’ স্লোগানটি কমিউনিটি ক্লিনিকের ব্রান্ডিং কার্যক্রমে ব্যবহার করা হচ্ছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার আগে ও পরে স্বাস্থ্যসেবার অবকাঠামোগুলো ছিলো মূলত শহরকেন্দ্রিক। অথচ সে সময় ৮৫ শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করতো। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়ার। বঙ্গবন্ধুই স্বাস্থ্যসেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় অর্থাৎ সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে মাত্র তিন বছরেই তিনি প্রতিটি থানায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ‘থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স’। চালু করেছিলেন ১০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের অভিনব ধারণা বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থায় এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। কমিউনিটি ক্লিনিকের জন্য জনগণ জমি দিয়ে থাকে আর সরকার সেই জমিতে অবকাঠামো নির্মাণ থেকে শুরু করে জনবল ও ওষুধ সরবরাহ করে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করে। পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্যসেবা দেয়ার এ মডেলটিই আজ বিশ্বব্যাপী সুনাম অর্জন করেছে। সরকারের পাশাপাশি সামাজিক সংগঠন, বেসরকারি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় দেশের গ্রামীণ জনগণের দোরগোড়ায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছ দেয়ার লক্ষ্যে সরকার ২০১৮ সালে‘কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট-২০১৮’ নামে একটি আইন করা হয়। এই আইন ও স্ট্রাস্টি বোর্ড গঠনের ফলে ক্লিনিকের কার্যক্রম পরিচালনা এবং জনবলের বেতন-ভাতাদিসহ আর্থিক ব্যয়ভার নিশ্চিতের জন্য অর্থ সংগ্রহের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। দেশে প্রায় সাড়ে আঠারো হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক চালু রয়েছে। কমিউনিটি সেন্টারে ১৩ হাজার ৬৬৭ জন কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (সিএইচসিপি) কর্মরত আছেন। যে জনবল মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্য পরিচর্যা, প্রতিষেধক টিকা (যক্ষ্মা, ডিপথেরিয়া, হুপিং কফ, পোলিও, ধনুষ্টংকার, হাম, হেপাটাইটিস-বি, নিউমোনিয়া ইত্যাদি) এবং শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা, পরিবার পরিকল্পনা-বিষয়ক স্বাস্থ্যসেবার মতো প্রাথমিক পর্যায়ের প্রায় ৩০টিরও বেশি রোগের চিকিৎসা ও পরামর্শ দিয়ে থাকে।

গ্রামীণ জনগণের অত্যাবশ্যকীয় চিকিৎসাসেবা বিতরণের প্রথম স্তর হলো কমিউনিটি ক্লিনিক। তৃণমূল পর্যায়ে সাধারণ মানুষের চাহিদা অনুসারে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার হিসেবে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করা হয়।ক্লিনিকে আগত সেবা গ্রহণকারীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্যানিটেশন, সুষম খাদ্যাভ্যাস, টিকার সাহায্যে রোগ প্রতিরোধ, কৃমি প্রতিরোধ, বুকের দুধের সুফল, ডায়রিয়া প্রতিরোধ এবং পুষ্টি সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো। শুরুতে

কমিউনিটি ক্লিনিকে সন্তান প্রসবের ব্যবস্থা ছিল না। তবে এখন দেশের প্রায় তিন শতাধিক কমিউনিটি ক্লিনিকে নরমাল ডেলিভারি বা স্বাভাবিকভাবে সন্তান প্রসব করানোর সেবা দেয়া হচ্ছে। কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে মানুষকে বিনামূল্যে ৩০ ধরনের ওষুধ দেয়া হয়। অসচ্ছল ও দরিদ্র ডায়াবেটিক রোগীরা বিনামূল্যে ইনসুলিনও পাচ্ছেন। বিনামূল্যে বিতরণের জন্য সরকার প্রতিবছর ৩০০ কোটি টাকার বেশি ওষুধ দেয়, যা ইডিসিএল থেকে নিয়ে থাকে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রমকে পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছে। জাতিসংঘের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা বিশ্বব্যাংক, জাইকা, ইউনিসেফ ইত্যাদি সংস্থা আর্থিক, কারিগরি ও লজিস্টিক সরবরাহের মাধ্যমে কমিউনিটি ক্লিনিকের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা করছে। এছাড়া বিভিন্ন এনজিও কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবার মানোন্নয়নে কাজ করছে। কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্টের তথ্য বলছে, ২০০৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ১৪১ কোটির অধিক ভিজিটের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণ কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে সেবা গ্রহণ করেছেন। যাদের অধিকাংশ নারী ও শিশু। গড়ে প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রতিদিন গড়ে ৪০ জন সেবাগ্রহীতা সেবা গ্রহণ করে থাকেন। যার ৮০ শতাংশ নারী ও শিশু। কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচালনায় স্থানীয় জনগণের ভূমিকা অপরিসীম।

স্বাস্থ্যখাতে বর্তমান সরকারের একটি ফ্লাগশিপ কর্মসূচি হলো কমিউনিটি ক্লিনিক। কমিউনিটি ক্লিনিক শুধু একটি উদ্যোগ নয়। কমিটি ক্লিনিক অনেকগুলো উদ্যোগের একসঙ্গে সমন্বয়। এই উদ্যোগের অধীনে তৃণমূল পর্যায়ে নিরবচ্ছিন্ন প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতি ৬ হাজার জন মানুষের জন্য একটি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করা হয়েছে। ২০ থেকে ৩০ মিনিটের হাঁটার দুরত্বে স্বাস্থ্য সেবা পাওয়া যাবে এমন পরিকল্পনায় ক্লিনিকগুলোর স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে। এই ক্লিনিকগুলোর মাধ্যমে গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণ দেশের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের সুযোগ লাভ করেছে। এর ফলে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবাগুলো এখন নারী, শিশু, বয়স্ক নাগরিকসহ সব প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষদের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে। দেশের দরিদ্রদের, বিশেষত নারীদের স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে এসব ক্লিনিক বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোর ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের ফলে এটা প্রতীয়মান হয়, কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ব্যাপক আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার ফলে বড়ো ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকি থেকে রক্ষা পায় রোগীরা। ছোটো ছোটো সমস্যায় যখন কমিউনিটি ক্লিনিক চিকিৎসা সেবা দেয় তাতে রোগীকে উপজেলা, জেলা বা বড়ো হাসপাতালে আর যেতে হয় না। এতে শুরুতেই রোগীরা প্রাথমিক পর্যায়ের সেবা পেয়ে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যায়। প্রাথমিক চিকিৎসা নিশ্চিতের ফলে মানুষের স্বাস্থ্যগত উন্নতি হয়েছে। বড়ো ধরনের রোগ থেকে মানুষ সতর্ক হতে পারছে। এতে দেশের মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে। করোনা ও ইপিআইয়ের ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রমও ভূমিকা রেখেছে কমিউনিটি ক্লিনিক। এটি শুধু একটি একক উদ্যোগ নয়, এটি একাধিক মহৎ উদ্যোগের সম্মিলিত রূপ।

বিনামূল্যে সেবাদান সহজ করার জন্য কর্মরত সব সিএইচসিপিকে ল্যাপটপ ও মডেম দেয়া হয়েছে। বর্তমানে ৯৫.৪৭ শতাংশ কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে ডিজিটালি অনলাইন রিপোর্টিং করা হচ্ছে। সেবা সহজীকরণের জন্য মাল্টিপারপাস হেলথ ভলান্টিয়ারের মাধ্যমে সিসিকর্ম এলাকায় অবস্থানরত খানার প্রত্যেক সদস্যের ডিজিটালি হেলথ ডেটা সংগ্রহ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১১ লাখ গ্রামীণ জনগণকে হেলথ আইডি কার্ড দেয়া হয়েছে। ১০৭টি উপজেলায় এ কার্যক্রম চলমান। পর্যায়ক্রমে সারাদেশে হেলথ আইডি কার্ড দেয়া হবে। এছাড়া প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে বিভিন্ন প্রকার রেজিস্টার, ফরম, এএনসি কার্ড, জিএমপি কার্ড ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। এসব রেজিস্টারে তথ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

শুক্রবার ব্যতীত সপ্তাহে ছয় দিন সিএইচসিপির কমিউনিটি ক্লিনিকে উপস্থিত থেকে সেবা প্রদান করেন। স্বাস্থ্যকর্মী এবং পরিবার কল্যাণ সহকারীরা সপ্তাহে তিন দিন করে কমিউনিটি ক্লিনিকে বসেন। সিএইচসিপিরা স্বাস্থ্য সহকারীদের তদারকি করবেন। প্রশাসনিক কর্ম এলাকায় (প্রতি ইউনিয়নে ৯টি) ওয়ার্ডভিত্তিক মাঠকর্মীদের পদায়ন করা হয়। যদি কর্মীর সংখ্যা বেশি হয় তবে জনসংখ্যার ভিত্তিতে তা সমন্বয় করে পদায়ন করা হয়। স্বাস্থ্য সহকারী অথবা পরিবার কল্যাণ সহকারী একে অপরের অনুপস্থিতিতে কমিউনিটি ক্লিনিকে সব সেবা নিশ্চিত করেন। কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবাগ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য স্বাস্থ্য সহকারী এবং পরিবারকল্যাণ সহকারী বাড়ি পরিদর্শনকালীন সময় আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবা সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করে থাকেন। এসব ক্লিনিকের সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটি ছাড়া প্রতিদিনই সকাল ৯ টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত সেবা দেওয়া হয়।

যেসব গর্ভবতী মহিলা কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে প্রসবপূর্ব ও প্রসবোত্তর সেবা গ্রহণ করেননি, স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যাণ সহকারীরা তাদের খুঁজে বের করে কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবা ব্যবস্থায় নিয়ে আসেন। এছাড়া যেসব নারী-পুরুষ ইপিআই, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ

ইত্যাদি বিষয়ে কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে সেবা গ্রহণ করেননি, তাদেরও এই সেবা ব্যবস্থায় নিয়ে আসা হয়। কমিউনিটি ক্লিনিকের কার্যক্রম সফল, শক্তিশালী ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র রেফারেল সেন্টার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সারা দেশে ৪ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাভাবিক প্রসব সেবা দেয়া হয়।

প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী চিন্তার ফসল হিসেবে স্বাস্থ্যসেবা এখন বাংলাদেশের একেবারে প্রান্তিক পর্যায়ে চলে গেছে। কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে জনগণকে প্রাথমিক পর্যায়ের সব সেবা ও বিনামূল্যে ওষুধ দেয়া হচ্ছে। সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে কমিউনিটি ক্লিনিক অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। দেশে কমিউনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা আরও বাড়ানোর কাজ চলছে। উন্নত সমৃদ্ধশালী স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে স্মার্ট স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করবে কমিউনিটি ক্লিনিক।

#

পিআইডি ফিচার